বিশেষ স্মরণিকা

ডঃ কুমুদ রঞ্জন নস্কর
এক তন্নিষ্ঠ সুন্দরবন গবেষক

চলে গেলেন 'স্বাস্থ্য, শিক্ষা, উন্নয়নে'র পৃষ্ঠপোষক, নিয়মিত লেখক, বিশিষ্ট উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ডঃ কুমুদ রঞ্জন নস্কর। সুন্দরবনের সঙ্গে তাঁর নাম প্রায় সমার্থক হয়ে গেছিল। সুন্দরবন নিয়ে কেউ কিছু জানতে চাইলে কি পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতের অন্যত্র তাঁর শরণাপন্ন হতে হোত। সুন্দরবনকে তিনি প্রচণ্ড ভালবাসতেন। জীবনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ সময় তিনি সুন্দরবনের উপর গবেষণা করে কাটিয়েছেন। সুন্দরবন নিয়ে তাঁর এই তন্নিষ্ঠ গবেষণা দৃষ্টি আকর্ষণ করত। কর্মসূত্রে তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস্য গবেষণাকেন্দ্রের (সি.আই.এফ.আর.সি.) প্রধান বিজ্ঞানী। পাশাপাশি দু'বারের (একেকটি পাঁচ বছরের কার্যকালের) জাতীয় গবেষক। সুন্দরবনের উদ্ভিদ, জীব, বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ ছিল তাঁর গবেষণার মূল বিষয়বস্তু এবং সুন্দরবন রক্ষার সঙ্কল্প নিয়ে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেলা বিভিন্ন মঞ্চে জনপ্রিয় বক্তৃতা ও আলোচনা চালিয়ে গেছেন বছরের পর বছর। তিনি ছিলেন নিরলস ও নিরহঙ্কারী এক কর্মবীর যাঁর সৌজন্য ও আত্মরিকতা তাঁর সহকর্মী, সহগবেষক, ছাত্র সকলের হৃদয় ছুঁয়ে যেত। সুন্দরবন-প্রাণ কর্মচঞ্চল এই মানুষটি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

দক্ষিণ চব্বিশপরগণার এক প্রত্যন্ত গ্রামের এক সাধারণ পরিবারে কুমুদবাবুর জন্ম। বাবা ছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে উদ্ভিদবিদ্যায় অনার্স নিয়ে স্নাতক হয়ে প্রবল অর্থাভাব সত্ত্বেও খুব কষ্ট করে বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর হন। বিশাল অভাবী সংসারের ভরনপোষণের জন্য সেই সময় পাশাপাশি তাঁকে সরকারি বিদ্যালয়ে পড়ানোর কাজ নিতে হয়। এরপর তিনি বোটানিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার গবেষক হিসাবে কাজ শুরু করেন, তারপর সর্বভারতীয় পরীক্ষা দিয়ে I.C.A.R.-র অধীনে CIFRC-তে যোগ দেন। ইতিমধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি. করেন। তাঁর বিষয় ছিল "Floristic Survey of the district 24 Paraganas in West Bengal (India) with special reference to the Mangrove Vegetation of the Sundarban."। তিনি মনে করতেন সুন্দরবন না বাঁচলে দক্ষিণবঙ্গ বাঁচবে না, তাই গবেষণার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনের সাথে আমৃত্যু সুন্দরবন সংরক্ষণের কাজ করে গেছেন। তিনি ছিলেন প্রচার বিমুখ। তাঁর হাতে বহু গবেষক তৈরী হয়েছে, তিনি ১৪টি মৌলিক গ্রন্থ লিখে গেছেন। বাজারি পত্রিকায় তাঁর নাম শোনা যেত না, কিন্তু তাঁর প্রতিটি কাজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ মহলে সম্ভ্রম আদায় করেছে। তিনি নিয়মিত সোনাগাঁ সহ সুন্দরবনের অভাবতাড়িত গ্রামগুলিতে যেতেন এবং সেখানে আর্থিক অনুদান, বস্ত্র, পুস্তক প্রভৃতি প্রদানের পাশাপাশি ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ ও বিস্তার এবং বিকল্প অর্থনীতি সৃষ্টির প্রয়াস নিয়েছিলেন। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ভেষজ উদ্যান গঠন এবং সারগাছি, মুর্শিদাবাদ, কেন্দ্রে সমাজসেবায় তাঁর বিশিষ্ট অবদান ছিল। তাঁর প্রয়াণে সমাজ একজন যথার্থ সমাজসেবীকে হারালো, সুন্দরবন হারালো তাঁর প্রিয় স্বজনকে।

ডঃ অভি দত্ত মজুমদার
প্রতিভাবান গণবিজ্ঞান সংগঠক

এই সংখ্যায় মার্কিন-ভারত পরমাণু চুক্তি ও তার গভীর তাৎপর্য নিয়ে অভির লেখার কথা ছিল, অথচ দুর্ভাগ্য তাঁর স্মরণিকা লিখতে হচ্ছে। বামফ্রন্ট শাসনের শেষ দিক। **সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, নেতাই**– একটির পর একটি রাষ্ট্রীয় দমন পীড়ন। প্রতিবাদে উত্তাল রাজপথ। সেই রাজপথে যে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী নেমে এসে সমাজ পরিবর্তনের জন্য মিছিলে হেঁটেছিলেন আবার একচেটিয়া আগ্রাসন, 'এস.ই.জেড.', 'পরমাণু চুক্তি' প্রভৃতির কুফল সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবিদ-বিজ্ঞানী-বুদ্ধিজীবীদের দিশা দেখাচ্ছিলেন গণবিজ্ঞান ও পরিবেশ আন্দোলনের পথ ও পদ্ধতি নিয়ে তিনিই ডঃ অভি দত্ত মজুমদার।

ময়মনসিংহের স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবার যারা দেশভাগের ঘুর্ণাবর্তে হুগলীর ধনেখালিতে বসতি করেন, সেখানে অভির জন্ম ও বেড়ে ওঠা। মেধাবী ছাত্র হিসাবে অভি **'সাহা ইনস্টিটিউট অফ্ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স (এস.আই.এন.পি.)'** থেকে পি.এইচ.ডি. করেন। তারপর কানাডায় পোস্ট-ডক্টরেট করে এস.আই.এন.পি.-তে ফিরে এসে 'হাই এনার্জি ফিজিক্স ডিভিশনে' গবেষণা ও অধ্যাপনা শুরু করেন। এর পাশাপাশি শুরু সমাজ সেবার কাজ, সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রাম। তৈরী হয় **এফ.এ.এম.এ. (FAMA)** সহ একাধিক সংগঠন, শুরু হয় একচেটিয়া আগ্রাসন, এস.ই.জেড., রাসায়নিক হাব, পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র, জি.এম. বীজ ও খাদ্য, এফ.ডি.আই. প্রভৃতির বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। এই পর্যায়ে অভি নিরলসভাবে ঘুরে ঘুরে, আলোচনা ও তর্ক করে, বক্তৃতা দিয়ে, লেখালেখি করে জনমত সংগঠিত করছিলেন। কিন্তু অল্পবয়সে কর্কট রোগের থাবা তাঁর অতিমূল্যবান প্রাণটি অকালে ছিনিয়ে নেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক, নাগরিক, বিজ্ঞান ও পরিবেশ আন্দোলন ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ডাঃ অমল রায় চৌধুরী
জনদরদী অজাতশত্রু স্বাস্থ্য প্রশাসক

শ্বাসকষ্টজনিত রোগে দীর্ঘ ভোগের পর অমলদা চলে গেলেন। কে তাহলে খুঁটিয়ে লেখাগুলি পড়ে একটি দুটি কথায় মতামত জানাবেন? বিভিন্ন সমস্যায় পড়া মানুষজনের কথা ধৈর্য্য ধরে শুনে কেই বা এগিয়ে দেবেন সহযোগিতার হাত? বামফ্রন্ট তখন ক্ষমতার মধ্যগগনে, সিপিআইএম দলের তখন দোর্দন্ড প্রতাপ। অনিলায়ন বা রেজিমেন্টেশন্ যাই বলুন না কেন তার ভারে আকাশ বাতাস থরহরি কম্প। দলীয় নির্দ্দেশের এতটুকু এদিক

ওদিক হওয়ার জো নেই। পার্টির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, মেডিকেল ফ্রন্টের পদাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে কোন অহঙ্কার, কর্তৃত্ববাদ, চারিত্রিক বিচ্যুতি, অনীতিনিষ্ঠা বা সুযোগ সন্ধান কারো চোখে পড়েনি। একইভাবে সবাইকে নিয়ে কাটিয়ে দিলেন সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন। রক্তচক্ষুর ভুক্তভোগী মানুষজন, বিরোধী ধারার মতাবলম্বী সবাই আশ্রয় পেয়েছেন তাঁর দরাজ বুকে, লাভ করেছেন নিরপেক্ষ বিচার। তাঁর বহরমপুর, জলপাইগুড়ি ও স্বাস্থ্যভবনের অফিসে এবং বহরমপুরের গৃহে কিংবা লবন হ্রদের কোয়ার্টারে জেলা ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কত না মানুষ কত সমস্যা নিয়ে আসতেন।

মুর্শিদাবাদের ভিয়েতনাম নবগ্রামের এক বামপন্থী পরিবারে জন্ম। বাবা ছিলেন শিক্ষক আন্দোলনের সাথে যুক্ত, মামা বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমলাপতি রায়। সমাজতান্ত্রিক পরিবেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে বেড়ে ওঠা, তাই আমৃত্যু ছিলেন সাহসী, অবিচল ও নীতিনিষ্ঠ। বহরমপুরে পড়ার শেষে কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় জমানায় কলেজে বাম রাজনীতি করতে গিয়ে বারংবার আক্রান্ত ও রক্তাক্ত হন। বিভিন্ন গণ আন্দোলন ও রিলিফ আন্দোলনের সাথে সক্রিয় ছিলেন। পরে সরকারি চিকিৎসা পরিষেবায় যোগ দেন এবং উপমুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, সহস্বাস্থ্য অধিকর্তা বিভিন্ন দায়িত্ব সামলান। ছিলেন PRC, Students Health Home, IMA, AHSD বিভিন্ন সংগঠনের দায়িত্বে। দুর্নীতি, সুবিধাবাদ ও ভোগবাদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। ছিলেন একনিষ্ঠ পাঠক ও শ্রোতা এবং তাঁর মজার ছড়া লেখার হাত ছিল। তাঁর অকাল প্রয়াণে আমরা অভিভাবকহারা হলাম।

'বালেশ্বর যুদ্ধ' – শতবর্ষে ফিরে দেখা

– দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

১৯১৫-র ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ, পাঁচ বাঙালি যুবক অতি সন্তর্পণে বালেশ্বরের জঙ্গল পথে এগিয়ে চলেছে দেশমাতৃকার মুক্তিকল্পে আত্মবলিদানের উপযুক্ত যজ্ঞবেদীর সন্ধানে। কপ্তিপদা থেকে বার হবার পর গত তিনদিন ধরে তাদের না জুটেছে খাদ্য, না জুটেছে বিশ্রাম। তাদের পা যেন আর চলেনা। সামান্য কিছু পেটে না দিলে আর বুঝি এগোন যায় না। তাদের শিকারী কুকুরের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে ব্রিটিশ ফৌজ। তাদের সাথে কেবল পদাতিক সৈন্য নয়, জঙ্গলের পথে চলার জন্য আছে প্রশিক্ষিত হাতিও। সামনেই একটা গ্রাম পড়তেই তারা একটি দোকানে গিয়ে খাবারের খোঁজ করল। পেয়েও গেল, কিন্তু দাম দিতে গিয়ে হল বিপত্তি। খুচরো না থাকায় তারা দিয়েছিল দশ টাকার একটা নোট। সেকালের দশ টাকা। অনেক অনেক টাকা। চমকে উঠলো দোকানী। চেঁচিয়ে উঠল সে ডাকাত ডাকাত বলে। সারা গ্রামের লোক জড়ো হয়ে গেল সেখানে। সকলেরই কৌতুহল তাদের ঘিরে। কারণ তারা শুনেছে সরকারী ঘোষণা। পাঁচজন খুনে, ডাকাতির উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলে ঢুকেছে। তারা সবাই জর্মানের চর। এদের ধরিয়ে দিতে পারলেই বিরাট পুরস্কার। দেশ সেবার, সমাজ সেবার বিরাট কার্যকলাপের সঙ্গে যারা ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তারা আজ ডাকাতির অভিযোগে অভিযুক্ত। এই পাঁচ বিপ্লবী হলেন **দাদা - যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাযতীন), চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, নীরেন দাসগুপ্ত ও যতীশ পাল**। বিধাতার কি বিচিত্র অভিপ্রায়। আর কয়েক ঘণ্টা বাদে যারা দধিচীর মতো নিজেদের অস্থি দিয়ে বজ্র নির্মাণ করে তা দিয়ে যাবে আগামীকালকে, দেশমাতৃকার দাসত্ব শৃঙ্খল মোচনের জন্য তারা সেদিন চরম লাঞ্ছিত, অপমানিত নিজের দেশের মানুষের কাছেই। কিন্তু এতো সব পরের কথা। আগের কথা আগে হোক। না সে বাঘাযতীনের দু-দুবার কেবল ছোরা হাতে বাঘ মারার গল্প নয়, বা অপমানের জবাবে রেলস্টেশনে এক এক ঘুসিতে তিনজন গোরা মিলিটারিকে ধরাশায়ী করা বা রেলের কামরার ওপরের বাঙ্ক থেকে তিনজন মস্ত কাবুলিওয়ালাকে মেয়েদের সাথে খারাপ ব্যবহার করার জন্য টেনে নামিয়ে আনার অতি বলপ্রকাশের গল্প নয়। সেসব তো বাঙালির কিংবদন্তী। আগের কথা, বাঘাযতীনের হাতে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতির কথা।

১৯০৮ সাল। সারা বাংলাদেশ জুড়ে তখন সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী নানান দল, উপদল। যাদের মধ্যে অন্যতম বাংলার বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন **অনুশীলন সমিতি। স্বদেশ বান্ধব সমিতি, দরিদ্র ভাণ্ডার, অনাথ আশ্রম, বান্ধব কোম্পানি, সুহৃৎ সমিতি, সাধনা সমাজ, আত্মোন্নতি সমিতি, ব্রতী সঙ্ঘ** — এদের আবার নানা উপদল। কলিকাতায় **যতীন মুখার্জীর দল, হরিশা শিকদারের দল**, ময়মনসিংহের **হেমেন্দ্র কুমার আচার্য চৌধুরীর** দল, **বিজয় রায়ের** যশোর-খুলনার দল, **শ্রীশ ঘোষের** চন্দন নগরের দল, **সতীশ সেনগুপ্ত ও আশুতোষ দাসের** শ্রীরামপুরের দল, **নিবারণ ঘটকের** বাঁকুড়া দল এবং **পূর্ণচন্দ্র দাসের** মাদারিপুর দল প্রভৃতিরা ছিল সে সময় অত্যন্ত প্রভাবশালী। এদের কাজ বাহ্যিকভাবে বন্যা-খরা-মহামারিতে দেশের মানুষের স্বার্থে ত্রাণকার্য পরিচালনা; বিদ্যালয়, কলেজ প্রতিষ্ঠা করে দেশের মানুষকে শিক্ষাদান কিংবা বিভিন্ন কুটির শিল্পে স্ব-রোজগারের ব্যবস্থা করা কিন্তু আন্তরিকভাবে তাদের কাজ ছিল ইংরেজ সরকারের অন্যায়ের সক্রিয় প্রতিবাদ এমন কি প্রয়োজনে গুপ্ত হত্যা করে ইংরেজ এবং তাদের দ্বারা পুষ্ট ভারতীয়দের মনে ভীতির সঞ্চার করা। কিন্তু দলগুলির মধ্যে একতা না থাকায় এবং নিজেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা থাকায়,

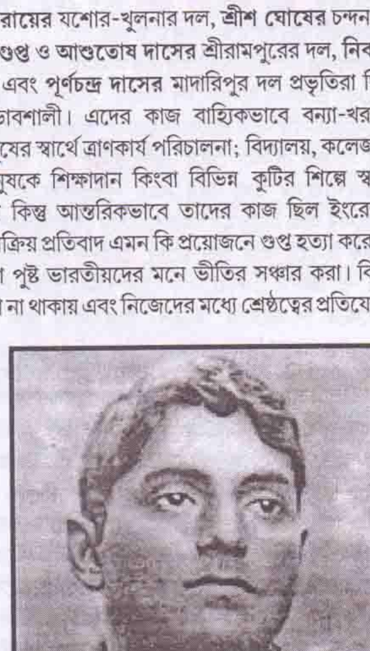

ডা: দারকানাথ কোটনিস

— দীপাঞ্জন রায়

ডাঃ দ্বারকানাথ শান্তারাম কোটনিস ৪ অক্টোবর ১৯১০, দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের সোলাপুরে এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ২ ভাই আর ৩ বোনের মধ্যে বড় হওয়া কোটনিস মহারাষ্ট্রের জি এস মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। অবশ্য এইসব তথ্যাবলীর মধ্যে ডাঃ কোটনিসকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

ডাঃ কোটনিসের সন্ধান পেতে গেলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে ১৯৩৭ সালে। এই বছর আগ্রাসী জাপ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত চীনা কমিউনিস্ট পার্টির লাল সৈন্যবাহিনীর জেনারেল Zhu Dhe ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কাছে ডাক্তার পাঠানোর জন্য আবেদন করেন। এই আবেদন ছিল একটি পরাধীন যুদ্ধরত জাতির আরেক পরাধীন স্বাধীনতাকামী জাতির কাছে সাহায্য আর সহমর্মিতার আবেদন। ভারতও সাড়া দিতে দেরি করেনি। তদানীন্তন জাতীয় কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে সংগৃহীত ২২ হাজার টাকা আর ৫ জন ভারতীয় ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে ১৯৩৮ সালে Indian Medical Mission চীনে পৌঁছায়। টীমে ছিলেন ডাঃ এম অটল, এম চোলকর, বি. কে. বাসু, ডি. মুখার্জী আর ২৪ বছর বয়সী ডাঃ কোটনিস। মিশন শেষ করে টিমের সব সদস্যই ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। একমাত্র ফিরে এলেন না ডাঃ কোটনিস। কারণ এরমধ্যে কোটনিস ভালোবেসে ফেলেছেন চীনের সংগ্রামী জনতা আর তাদের অনমনীয় সংগ্রামকে। এক পরাধীন দেশ থেকে আসা ডাঃ কোটনিসের কাছে আরেক পরাধীন জাতির চীনের এই সংগ্রাম, যা শুধুমাত্র জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত নয়, বরং সমস্ত রকম শোষণ, বঞ্চনা আর অন্যায়ের অবসানের উদ্দেশ্যে চালিত, তা এক অন্য মাত্রা নিয়ে দেখা দিয়েছিল। তিনি ঠিক করে ফেলেছিলেন নিজের জীবনের উদ্দেশ্যকেও এবং তা হল চীনের এই সংগ্রামের সহযোগী হয়ে ওঠা। ডাঃ কোটনিসের পরবর্তী জীবনকাল খুবই সংক্ষিপ্ত, অন্তত সংখ্যার হিসেবে। তবু ইতিহাস সাক্ষী এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি তার জীবনের উদ্দেশ্য পালনে ছিলেন নিরলস প্রয়াসী।

আর সেই প্রয়াসে ডাঃ কোটনিস ছুটে গেছেন চীনের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। কখনো Dr. Bethune International Peace Hospital-এর ডিরেক্টর হিসেবে, কখনো Dr. Bethune Hygiene School-এর লেকচারার হিসেবে, কখনো কোনও আহত সৈনিকের বিছানার পাশে ডাঃ কোটনিস তাঁর দায়িত্ব পালন করে গেছেন। অবশেষে ১৯৩৯ সালে Ji-Chai-Ji সীমান্তের Wutai পাহাড়ের কাছে তিনি যোগ দিলেন বিখ্যাত অষ্টম রুট আর্মিতে — সেই বাহিনীর নেতৃত্বে যিনি তাঁর নাম — মাও সে তুং।

এরপর ডাঃ কোটনিসের সৈনিকের জীবন শুরু হল। যে জীবন সবচেয়ে কঠিন, সবচেয়ে পরিশ্রমসাধ্য, আর সবচেয়ে মহান। ডাঃ নরম্যান বেথুনের জীবনী থেকে আমরা যে জীবনের আভাস পাই। শত্রু সৈন্যের কাছ থেকে যে কোনও মুহূর্তে আক্রমণের আশঙ্কা, প্রতিকূল আবহাওয়া, রুক্ষ প্রাকৃতিক পরিবেশ আর কষ্টকর বন্ধুর যাত্রাপথকে উপেক্ষা করে টানা ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত একনাগাড়ে হাসিমুখে চিকিৎসা করে যাওয়া, তার পাশাপাশি সৈন্যদের আর গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষা, ভয়াবহ প্লেগ মহামারীর প্রতিরোধ— ডাঃ কোটনিসের জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করল। এই ক্ষুদ্র সময়কালে অবশ্য এই অমানুষিক পরিশ্রম তার শরীরে ছাপ ফেলতে ছাড়েনি। ফলে মাত্র ৪ বছরের মধ্যে মারা গেলেন ডাঃ কোটনিস— ১৯৪২ সালের ৯ ডিসেম্বর মাত্র ৩২ বছর বয়সে— হ্যাঁ মানুষের মাঝেই, তাদেরই সেবারত অবস্থায়।

ডাঃ কোটনিস খুবই অল্প বছর বেঁচেছিলেন, মাত্র ৩২ বছর এবং তাঁর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সময়কালও, সেরকমভাবে দেখতে গেলে, খুবই ছোট, মাত্র ৪-৫ বছর। অথচ ভাবতে অবাক লাগে এই ৪-৫ বছরের ঔজ্জ্বল্যের কাছে অনেক দীর্ঘায়ু এমনকী শতায়ু মানুষের সারাজীবনকে নেতাহই ম্লান, বিবর্ণ বলে মনে হয়।

মাদাম সান ইয়াৎ সেন বলেছিলেন— ''বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যত পৃথিবীতে ডাঃ কোটনিসের জন্য বেশী সম্মান অপেক্ষা করছে, কারণ এই ভবিষ্যত পৃথিবীর জন্যই ছিল ডাঃ কোটনিসের লড়াই।'' কথাটা মিথ্যে প্রমাণিত হয়নি। ভারত ও চীন দুই দেশই ডাঃ কোটনিসের সম্মানে ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। ডাঃ কোটনিসকে নিয়ে দু'দেশেই লেখা হয়েছে অনেক বই (যার মধ্যে খাজা আহমেদ আব্বাসের একটি বইয়ের নাম 'যে আর ফিরে আসেনি'), তৈরী হয়েছে সিনেমা (''ডাঃ কোটনিস কি অমর কাহানী'', ১৯৪৬, ভি শান্তারাম), চীনের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা এদেশে এলে নিয়ম করে তাঁর আদি বাড়িতে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করতে যান, কিন্তু বোধহয় এসব রাজকীয় সম্মান আর মর্যাদার মধ্যে নয়, ডাঃ কোটনিসকে সত্যিকারের সম্মান আর ভালোবাসা দেখানো হল তখন — যখন ২০০৫ সালে চীনে "Qinming" উৎসব চলার সময় (এটি একটি চীনা উৎসব যেখানে পূর্বপুরুষদের সম্মান জানানো হয়) হাজার হাজার মানুষ ডাঃ কোটনিসের সমাধিতে ফুল দিয়ে তার সমাধিক্ষেত্র পুরো ঢেকে দিল।

তাঁর এই নবীন সহযোগীর মৃত্যুতে মাও সে তুং বলেছিলেন— ''সৈন্যবাহিনী হারাল এক সহযোগী আর জাতি হারাল তার এক বন্ধুকে। আমরা যেন ডাঃ কোটনিসের আন্তর্জাতিকতা বোধের স্বপ্নকে বহন করে নিয়ে যেতে পারি।'' আজ, ডাঃ কোটনিসের জন্মশর্তবার্ষিকী বর্ষে এই আশাই প্রকাশ করা হচ্ছে।

———●———

○ **শর্তসাপেক্ষ আর্থিক সহায়তা দিয়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি ঃ** খ্রীস্টান মেডিকেল কলেজ, ভেলোরের অধ্যাপক কে. এস. জেকব তথ্য প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন ধনতন্ত্রে ধনী দারিদ্রের মধ্যে দুরত্ব বৃদ্ধি, ব্যাপক খাদ্যাভাব, অনাহার, অপুষ্টি, কর্মহীনতা, স্বাস্থ্যের অভাবের মধ্যেও মাত্র ০.৫% জি. ডি. পি.-র নীচে খরচ করেও লাতিন আমেরিকার সমাজগণতন্ত্রী দেশগুলি দারিদ্র্য দূরীকরণে অনেক এগিয়েছে, স্বাস্থ্যেরও উন্নতি ঘটিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি আর্জেন্টিনার 'Universal Child Allowanance Programme, ব্রাজিল ও মেক্সিকোর শর্তসাপেক্ষ আর্থিক সহায়তা প্রকল্প বা Conditional Cash Transfer Scheme (CCTS), দক্ষিণ আফ্রিকার Child Support Grant, তাইল্যাণ্ডের Universal Health Care প্রভৃতি সফল প্রকল্পগুলির কথা বলেছেন। CCT-র উপর তিনি জোর দিয়েছেন। আমাদের দেশে CCT হিসাবে জননী সুরক্ষা যোজনা (JSY) অনেকটা সফল হয়েছে ও আরও সাফল্যের সম্ভাবনা আছে। অন্যদিকে ভুল প্রয়োগে Sterilization Programme মার খেয়েছে। এই CCTগুলি তখন ই ভালভাবে কাজে লাগানো যাবে যখন ভাল স্বাস্থ্য পরিষেবা গড়ে তোলা যাবে (NRHM-র মাধ্যমে অনেকটা সুযোগও এসেছে) এবং শিক্ষা, চেতনা, পুষ্টি ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে।

○ **দেবী শেঠীর প্রস্তাবনা ঃ** ব্যাঙ্গালুরু কেন্দ্রিক নামী হৃদশল্যাবিদ ডা: দেবী শেঠি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করে পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির জন্য একগুচ্ছ প্রস্তাব দিয়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হল: (১) প্রতিটি জেলায় অন্তত ১৫টি টারসিয়ারি হাসপাতাল গড়ে তোলা যেগুলিতে যাবতীয় রোগ নির্ণয় ব্যবস্থা এবং ডায়ালিসিস ও ক্যাথ ল্যাবের ব্যবস্থা থাকবে। (২) চার লক্ষ শিক্ষক সহ নাগরিকদের স্বাস্থ্যবীমার ব্যবস্থা এবং পুলিশ কর্মীদের জন্য 'ক্যাশলেস' চিকিৎসা বীমার সুযোগ দান, (৩) রাজ্যে নতুন ২৫টি মেডিকেল ও নার্সিং কলেজ গড়ে তোলা। এখন দেখার বিষয় এগুলি কারা কিভাবে কতদিনের মধ্যে করবে? চিকিৎসার খরচ কেমন হবে? সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে থাকবে কি, না শহুরে হাসপাতালের 'ঘটি বাটি বিক্রি'র ব্যবস্থা গ্রামেও ঢুকে পড়বে? বীমা থাকলে সতি সত্যিই কি পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা পাওয়া যাবে? লক্ষ লক্ষ মানুষের থেকে সংগৃহীত কিস্তির বিপুল টাকা কোথায় যাবে? ২৫টি মেডিকেল কলেজের শিক্ষাও চিকিৎসার গুণমান কি বজায় থাকবে? সেখান থেকে স্নাতক হওয়ার পর ডাক্তার ও নার্সরা কি করবে?

ডা: সুজিত কুমার দাস

— সম্পাদকমণ্ডলী

প্রায় ৭৪ বছর বয়সে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ অকৃতদার ডা: সুজিত কুমার দাশ সকলকে ছেড়ে চলে গেলেন। দিয়ে গেলেন তাঁর দেহকে, চিকিৎসা শিক্ষার কাজে, কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ছাত্রদের জন্য। এবং অবশ্যই ৪০ বছরেও বেশী তাঁর জীবনের ঘটনাবহুল বিষয়গুলিকে।

পেশায় স্বনামধন্য হয়েও তিনি পেশার গ্রাসে আবদ্ধ হননি। চিকিৎসার পণ্যায়নের বিরুদ্ধে সরব ছিলেন আমৃত্যু। সরকারী চিকিৎসকদের সংগঠন তৈরী এবং বিভিন্ন দাবীর আন্দোলন করতে গিয়ে ৭০ এর দশকে বারবার রাজরোষে পড়তে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু কখনও মাথা নত করেননি। বর্তমানে সরকারী চিকিৎসকরা যে সকল সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন তার অন্যতম সূচনাকারী ছিলেন ডা: দাশ।

১৯৮৪ সালের ভূপাল গ্যাস কাণ্ডের কথা সবারই জানা। ''No More Bhopal Committee'' তৈরীর কলকাতায় তিনি ছিলেন প্রধান সংগঠক। পরে সুপ্রীম কোর্ট নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ কমিটির দু-জন বেসরকারী বিশেষজ্ঞের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

''Drug Action Forum'', সংগঠনটি অন্যদের নিয়ে ১৯৮৬ সালে তিনি গড়েছিলেন একটি বিশেষ দর্শন থেকেই, ''মানুষের জন্য ওষুধ না ওষুধের জন্য মানুষ''— কোনটা ঠিক! এবং নিয়মিত পত্রিকাও ইংরাজীতে প্রকাশ করেন, — ''Drug, Disease, Doctor''। ঐ সংগঠন এবং তার মুখপত্র সারা ভারতবর্ষে অপচিকিৎসা ও অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে লড়াইতে মানুষের অন্যতম হাতিয়ার বলে পরিগণিত হয়। এবং এইসব কিছুরই প্রাণ পুরুষ ছিলেন ডা: সুজিত কুমার দাশ।

বর্তমান সময়ে যখন সাম্যবাদের আদর্শ পদাহত, সুজিত দাশ কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সংকট ও সমাধানের অনুসন্ধানে ১৯৯১ সালে একটি বই প্রকাশ করেন ''কমিউনিজম্ ও গণতন্ত্র''। তাঁর মতে — ''কমিউনিজম্ ও গণতন্ত্র নিয়ে পূণর্বিচারে তদারিকটা জরুরী হয়ে পড়েছে। গলদটা কোথায় তার অনুসন্ধান আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে গোঁড়া কমিউনিস্টরা জীবনে কোনদিন খোলা মনে আত্ম-সমালোচনা করে নি। আজ সংকটের মুখোমুখি হয়ে তা করতে আরো ভয় পাচ্ছে। নেতারা আরো বিচলিত, কারণ আত্মসমালোচনা করলে নেতৃত্ব হারাবার ভয় আছে। অথচ পরিবর্তনের প্রবল বেগ কাউকে খাতির করছে না, করার কথাও নয়। এই পরিবর্তনের চরিত্র ও গতি বুঝতে হলে খোলামনের আলোচনা ছাড়া আর কোন পথ নেই; পুরানো ফরমূলাগুলি অকেজো হয়ে পড়েছে।''

ডা: সুজিত কুমার দাশ কে স্মরণ করতে গিয়ে তাঁর আরো বহু বিষয় মনে পড়ে যায়। ডা: বিনায়ক সেন যখন ২০০৯ সালে কলকাতায় একটি স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানে আসেন তখন ডা: দাশকে এ বিষয়ে জানালে তাঁর অসুস্থ শরীরের কথা এড়িয়ে গিয়ে বলেন, ''হ্যাঁ আমি কিন্তু ওখানে শুনতে যাবো, কিছু বলার জন্য অনুরোধ যেন না আসে।'' স্পষ্ট কথা তিনি অকপটেই বলতেন। এবং কোন তোষামোদই বোধহয় কেউ তাঁর মধ্যে দেখেন নি।

শ্রী হরিপদ দাস

— সম্পাদকমণ্ডলী

শ্রী হরিপদ দাশ : প্রায় ৮০ বছর আগে অধুনা বাংলাদেশের পদ্মাপাড়ে হরিপদ বাবুর জন্ম। কর্মস্থল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান। স্বাস্থ্য বিভাগের সাধারণ স্বাস্থ্যকর্মীর পদ মর্যাদা থেকে 'বড়বাবু'র পদে উন্নতি। এটা তাঁর সাধারণ পরিচয়। তিঁনি আজ আমাদের সকলের স্মরণীয় হলেন কিভাবে, সে কথাতেই আসছি।

স্বাস্থ্যকর্মী বা 'বড়বাবু' যে পদেই যখন ছিলেন, তিনি তাঁর সহকর্মী চেনাজনের সমস্যার কথা শুনেছেন এবং সমাধানের চেষ্টা করেছেন। এভাবেই তিঁনি রাজ্যসরকারী কর্মচারী সংগঠনের সাথে নিজেকে প্রবলভাবে যুক্ত করেন। এবং একই সঙ্গে সংগঠনের গণ চরিত্র বজায় রাখার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থের কোন সুযোগও দেননি। একাজের জন্য তাঁকে অনেক কঠিন সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। ৭০-এর দশকে পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে তাঁকে বহু ধরণের জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়। কিন্তু অসম সাহসী হরিপদবাবু ভয়ে হাতগুটিয়ে বসে থাকেন নি। ঐ দুর্দিনেও তিনি সাধারণ মানুষের কথাই ভেবেছেন, ব্যক্তিগত স্বার্থকে বড় করে দেখেননি।

চাকরী থেকে অবসর নেওয়ার পরে সাধারণতঃ মানুষ যখন আয়েস করতে চান, হরিবাবু কিন্তু বিপরীত পথে পা বাড়ালেন। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন, জনস্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তোলার সংগঠন, গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষদের জন্য নতুন ধরণের সংগঠন গড়ার কাজ শুরু করেন তাঁর জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর এবং অন্য জেলাতেও। প্রায় ৮০ বছর বয়সেও তিনি সুদুর মেদিনীপুর শহর থেকে কোলকাতার ঘনঘন যাতায়াত করতেন সাধারণ মানুষের সংগঠনের স্বার্থে। সমস্যা দেখে সমাধানের উদ্দেশ্যে তিনি সক্রিয় হতেন এবং কখনোই কোন রঙ দেখে নয়।

রবিবার, ১৭ই এপ্রিল ২০১১, তাঁর জীবনের শেষে ভোরের আলোতেও তিনি ব্যস্তভাবে প্রাতকৃত্য সেরে তৈরী হতে চেয়েছিলেন ঐ দিনের প্রথম বাসটি ধরে মেদিনীপুর শহর থেকে বেলপাহাড়ী গিয়ে বঞ্চিত ও মেহনতী মানুষকে সংগঠিত করতে। তিনি সেখানে যেতে পারেন নি কিন্তু তাঁর গুণমুগ্ধ মানুষজন ঐ ৮০ বছরের তরুণপ্রাণ মানুষটিকে তাঁর শেষ যাত্রায় শুধু চোখের জলে নয় বরং নতুন পৃথিবী গড়ার সংকল্প গ্রহণের মধ্যে স্মরণ করেছেন।

''হরিবাবু'' দের মৃত্যু, নতুন প্রাণের জন্ম দেয়। অমর হয়ে থাকেন আগামী দিনের স্বপ্ন সন্ধানীর মধ্যে — যাঁরা শপথ নিচ্ছেন - যেখানে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল'' নেই এমন এক ধরীত্রি গড়ার। শ্রী হরিপদ দাস অমর রহে ।।

Obituary 1

Dr. Granado passes away

– Comp : Arani Sen

Alberto Granado, who accompanied Ernesto 'Che' Guevara on a 1952 transcontinental journey of discovery across Latin America that was immortalized in Guevara's memoir and on-screen in "The Motor Cycle Diaries", died in Cuba on 5.03.' 11.

Granado and Guevaras' road trip, begun on a broken down motor cycle they dubbed La Poderosa (The Powerful) awoke in Guevara a social consciousness and political convictions that would help turn him into one of the most iconic revolutionary of the 20th century.

In our school days when we read 'Che Guevara's Diary', translated by 'Padatik' poet Suvash Mukhopadhaya, our hairs became straight. Later we read different books on Che as well as his writings. Here we must mention one excellent translation of Che's memoir with photos, 'Cholte Che,' published by Riti Prakashani. We became spelbound finding the high level of thinking, quest and convictions at their early medicos lives and their planning and organization of such a brave, difficult, long, adventurous and romantic voyage.

Also another great film on their journey is "The motor Cycle Diaries" produced byRobert Redford and directed by Walter Sallas of Chile. The film is not only an authenticated documentation of the famous journey but it also vividly depicts the mental transformation of Che and Granado toward underprivileged. Witnessing deep poverty and oppression across the continent– Chile to Colombia, particularly the mine workers and leper patients of Peru they changed their future aims of lives. Cinematographically the film is also superb and brings us to the wonderful nature and beautiful lives of Latin America, The La Plata, The Pampas, The Patagonia, The Pacific Coast, The Andes, The forests of upper stream Amazon etc.

After the journey Granado stayed at a leper clinic in Venezuela and Che went up to Miami, US, returned to Buenos Aires to finish his medical course and then dedicated himself for revolutions in Latin America and Africa. After Cuban revolution at Che's invitation Granedo visited Cuba and spent a low profile life there teaching Bio Chemistry in Havana University.

ডঃ রামদয়াল মুণ্ডা

স্বাধীনতা লাভের আগে থেকে দক্ষিণ বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলে আদিবাসীদের স্ব-শাসনের দাবিতে যে শক্তিশালী ঝাড়খণ্ড আন্দোলন চলছিল আশির দশকে তা তীব্র আকার ধারণ করে নতুন ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনে পরিণতি লাভ করে। তখন একাধারে যৌথ আন্দোলনে সামিল আবার পারস্পরিক যুযুধমান ঝাড়খণ্ড দলগুলি আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যে পিতৃবৎ চরিত্রের কথা ফেলতে পারত না তিনি হলেন ডঃ রামদয়াল মুণ্ডা। ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনে ডঃ মুণ্ডার অবদান অসামান্য। একাধারে সঙ্গীতজ্ঞ, বাদক, নর্তক, বহুভাষাবিদ, লেখক, গবেষক, নৃতত্ত্ববিদ, প্রতিষ্ঠান-সংগঠক ডঃ মুণ্ডা। তাঁর ১৯৩৯ সালে রাঁচী জেলার প্রত্যন্ত দিউরি গ্রামে দরিদ্র মুণ্ডা পরিবারে জন্ম। আমলেশা গ্রামে মিশনারি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ। মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার জন্য ৪০ কি.মি. দূরে মহকুমা শহর খুন্তীতে গমন। বীরসা ভগবানের কর্মকান্ডসিক্ত খুন্তীতে থাকার সময় বিদেশি নৃতত্ত্ব গবেষকদের সংস্পর্শে এসে নৃতত্ত্বে অনুরাগ। নৃতত্ত্বে রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ও আদিবাসী ভাষা নিয়ে পি. এইচ. ডি. করেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। শিকাগো ও মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা। দেশে ফিরে রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ে আদিবাসী ও আঞ্চলিক ভাষা বিভাগের দায়িত্বভার নেওয়া। তারপর রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। এর পাশাপাশি ছাত্রাবস্থা থেকে উপাচার্য স্তর অবধি আদিবাসী গান ও নাচের চর্চা ও দলগঠন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে আদিবাসী সংস্কৃতির বিকাশের মধ্য দিয়েই আদিবাসীরা বেঁচে থাকবে। তাই আদিবাসীদের জল-জমিন-জঙ্গলের অধিকারের লড়াইয়ের সাথে সাথে ভাষা-নাচ-গান-শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশের আন্দোলনও গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর চেষ্টাতেই ঝাড়খণ্ডের গ্রামগুলিতে আদিবাসী আখড়াগুলি পুনরুজ্জীবিত হতে থাকে। মৃত্যুর আগে অবধি 'সারা ভারত আদিবাসী মহাসভার' ব্যানারে সারা দেশের বৈচিত্র্যময় আদিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করে একটি মঞ্চে আনার চেষ্টা করছিলেন। তিনি সঙ্গীত নাটক একাদেমী ও পদ্মশ্রী পুরস্কার পান। তিনি ছিলেন রাজ্যসভার ও জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, রাষ্ট্রপুঞ্জের জনজাতি সংক্রান্ত কার্যানির্বাহী দলের উপদেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক জনজাতি ও আদিবাসী মহাসঙ্ঘের আধিকারিক। আদিবাসীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দীর্ঘ পেটানো চেহারার ও আজানুলম্বিত চুলের অধিকারী ডঃ মুণ্ডাকে সকলের সাথে নাগোরা বাজাতে বাজাতে আর নাচতে দেখা যাবে না।

মামনি রায়সম

অসমিয়া সমাজের জীবন যন্ত্রণা চার দশকের বেশি সময় ধরে তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে এঁকে চলেছিলেন ইন্দিরা গোস্বামী ওরফে মামনি রায়সম। সকলের প্রিয় 'বড় দিদি'। বলা হয় মামনি রায়সম যখন বলেন অসমবাসী তখন শোনেন। সারাজীবন বাঙ্ময়ভাবে তিনি নারী ও প্রান্তিক মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে এসেছেন। তিন দশকের বেশি হিংসা ও গৃহযুদ্ধের পর অসমে শান্তির বাতাবরণ রচনায় তাঁর ছিল প্রধান ভূমিকা। 'সম্মিলিত জাতীয় আবর্তন' ও 'পিপলস্ কনসালটেটিভ গ্রুপ (PCG)' গড়ে তুলে দীর্ঘ প্রচেষ্টায় তিনি সরকার ও 'আলফা'কে এক আলোচনার টেবিলে বসাতে সক্ষম হন। ১৯৪২এ কামরূপের ঐতিহ্যময় বৈষ্ণব 'সত্রে'র অধিকারী বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম ও প্রবল ধর্মীয় অনুশাসনে বড় হওয়া। পরবর্তীকালে তাঁর বিখ্যাত 'দাঁতাল হাতীর উনে খাওয়া হাওদা' বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি ধর্মীয় অনুশাসনে দীর্ণ নারীর যন্ত্রণা প্রস্ফুটিত করেন। শিলং ও গুয়াহাটিতে পড়াশুনা। গোয়ালপাড়ায় শিক্ষকতা, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। সেখানে আধুনিক ভাষা সাহিত্যের প্রধান এবং এমারিটাস অধ্যাপক। বিয়ের মাত্র দুবছরের মধ্যে মাত্র ২৩ বছর বয়সে কাশ্মীরে পথ দুর্ঘটনায় স্বামীর মৃত্যু। 'রামায়ণ — গঙ্গা টু ব্রহ্মপুত্র', 'মামারে ধারা তরোয়াল আর দুখন উপন্যাস', 'নীলকণ্ঠব্রজ', 'পেজেস স্টেইনড উইথ ব্লাড', 'আধলেখা দস্তাবেজ', 'দি চেনাব'স কারেন্ট' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। তিনি সাহিত্য একাদেমী, জ্ঞানপীঠ, প্রিন্স ক্লস এওয়ার্ড, কথা সম্মান, ভারত নির্মাণ সম্মান, ডি. লিট সহ অসংখ্য সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিতা।

বাদল সরকার

অসাধারণ নাট্য ব্যক্তিত্ব যিনি নাটককে রঙ্গমঞ্চ থেকে নিয়ে এসেছিলেন আমজনতার দরবারে, খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিদিনকার লড়াইয়ের ময়দানে। জন্ম ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে। পারিবারিক নাম সুধীন্দ্রনাথ। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের স্নাতক, ইংল্যাণ্ডে টাউন প্ল্যানার রূপে কর্মজীবন। ১৯৬৭-র বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ তাঁর প্রাণে অনুরণন ছড়ায়। উদীয়মান কৃষক সংগ্রামের উপর নৃশংস রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন তাঁকে রক্তাক্ত করে। নাটককে বেছে নেন প্রতিবাদের মাধ্যম হিসাবে। তাঁর হাতে পড়ে নাটক হয়ে ওঠে প্রসেনিয়ামের বাইরে এক জীবন্ত জনপ্রিয় গণমাধ্যম।

১৯৬৭-তেই গড়ে তোলেন 'শতাব্দী' নাট্যগোষ্ঠী। তারপর 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'স্পার্তাকাস', 'মিছিল', 'ভোমা', 'পাগলা ঘোড়া', 'বাসি খবর' প্রভৃতি একটার পর একটা সফল সৃষ্টি নিয়ে গ্রাম নগর মাঠ পাথার বন্দরে ছুটে বেড়ান। পুলিশ-প্রশাসনের রক্ত চক্ষু, রাজনৈতিক গুন্ডাদের আক্রমণ কোন কিছুই তাঁকে টলাতে পারেনি। তাঁর অনন্য নাট্যশৈলী বাংলার গন্ডি পেরিয়ে হিন্দি বলয়ে জনপ্রিয়তা পায়। তাঁর নাটক বহু ভাষায় অনুদিত হয়ে মঞ্চস্থ হয়। নানাবিধ পট পরিবর্তনের মধ্যেও এই প্রতিভাবান শিল্পী আমৃত্যু ছিলেন আপোষহীন। দু-দুবার পদ্মভূষণ খেতাব ফিরিয়ে দেন। রাজ্যের বাম সরকারের উপেক্ষা সত্বেও বামপন্থা ও প্রগতিশীলতায় আস্থা হারান নি। তিনি যে মানুষের আপনজন ছিলেন।

গুরশরণ সিংহ

পাঞ্জাবের এই অকুতোভয় নাট্য ব্যক্তিত্ব ৮২ বছর বয়সে চলে গেলেন। রেখে গেলেন বিপ্লবী গণনাট্যের এক সমৃদ্ধিশীল ঐতিহ্য, বিখ্যাত 'বাবা বোলতা হ্যায়', 'জঙ্গিরাম কি হাভেলি' 'গাড্ডা' সহ ১৫০ টিরও বেশি নাটক। ১৬ বছর বয়সে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন। সারাজীবন সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে গ্রামীণ সহজ ভাষায় স্থানীয় বিষয় নিয়ে জনপ্রিয় নাটক রচনা করেছেন এবং সেগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে মঞ্চস্থ করে গেছেন। জরুরি অবস্থায় 'মিথ্যা সঙ্ঘর্ষের' নামে হত্যা প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদ করায় তাঁকে কারারুদ্ধ হতে হয়। আবার খালিস্থানী আন্দোলনের সময় সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করে তিনি গ্রামে গঞ্জে বিপ্লবী শহীদ ভগৎ সিংহের আদর্শ প্রচার করে বেড়ান। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর হিন্দি বলয়ে ১৯৮৫ তে 'জন সাংস্কৃতিক মঞ্চ' (জ স ম) গঠনের তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা, এবং 'জ স ম'-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। এছাড়াও তিনি শিল্পাঞ্চলের ট্রেড ইউনিয়ন ও গণ আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ছিলেন 'ইন্ডিয়ান পিপলস্ ফ্রন্টের' জাতীয় উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য।

ডঃ ভূপেন হাজারিকা

'আমার গানের হাজার শ্রোতা
তোমায় নমস্কার
গানের সভায় তুমিই তো প্রধান অলঙ্কার ...'

চলে গেলেন প্রবাদ প্রতিম সঙ্গীত শিল্পী ডঃ ভূপেন হাজারিকা।

'এই কাজল কাজল দিঘি আর পদ্মপাতার নাল
দেখি মনে পড়ে হিজল ফুলি আলতা দুলি পা
সেই তো আমার মা চাঁদ উজালি মা ...'

অসমের সংস্কৃতি জগৎ অভিভাবক হারা হল।

'বিস্তীর্ণ দুপাড়ে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনে
ও গঙ্গা তুমি বইছ কেন?' ...

তাঁর দীর্ঘজীবনের বিস্তৃত অধ্যায়ে তিনি সমাজ সচেতনতার গানই গেয়ে গেছেন।

'বিমূর্ত ঐ রাত্রি আমার মৌনতা এই সুতোয় বোনা
একটি রঙীন চাদর
সেই চাদরের ভাঁজে ভাঁজে নিঃশ্বাসের ছোঁয়া
আছে ভালবাসার আদর —
দূরের আর্তনাদের নদীর ক্রন্দন কোনো ঘাটে
দুঃখের খেই পেয়েছি আমি আলিঙ্গনের সাগর
সেই সাগরের স্রোতে আছে নিঃশ্বাসেরও ছোঁয়া
আছে ভালবাসার আদর ...'

সারাজীবন ভালোবাসার কথা বলে গেছেন।

'মানুহে মানুহর বাবে
মানুষ মানুষের জন্য
হৃদয় হৃদয়ের জন্য
একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না ...'

আর বলে গেছেন শুধু মানুষের কথা।

'আজ জীবন খুঁজে পাবি
ছুটে ছুটে আয় ...'

শুধু জীবনের কথা।

'মোরা যাত্রী এক তরনীর
সহযাত্রী এক ধরণীর ...'

সাম্যের কথা।

'দোলা দোলা
আঁকাবাঁকা পথে মোরা
কাঁধে নিয়ে ছুটে যাই
রাজা মহারাজাদের দোলা
আমাদের জীবনের ঘামে ভেজা শরীরের
বিনিময়ে পথ চলে দোলা ...'

শোষণের ও বৈষম্যের কথা।

'শরৎবাবু খোলা চিঠি দিলাম তোমায়
তোমার গফুর মহেশ এখন কেমন আছে জানিনা

'গেল বছর বন্যা হোলো এ বছর খরা
একটুকু ঘাস পায় না মহেশ-
এক মুঠো ভাত খেতে না পায় গফুর-আমিনা —
শরৎবাবু জানিনা আমার এ চিঠি পাবে কি না? ...'

সঙ্কটের কথা।

'সজনী সজনী পদ্মাপাড়ে ছিলাম
সজনী সজনী পদ্মা পার হইলাম
সজনী সজনী চাকরি তো খুঁজেছি
সজনী সজনী ঘর-বাড়ি ছেড়েছি
সজনী সজনী থাকব না আর ফরিদপুরেতে ...'

সমস্যা অভাবের কথা।

'ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ ডম্বরু মেঘে ডাকে ডম্বরু
ঝিকিমিকি বিজলি নাচে
ছোটো ছোটো গাঁয়ে ছোটো ছোটো মানুষের
ছোটো ছোটো কুটির কাঁপে
ঘুণ ধরা সমাজের অন্যায় ওরা পায়ে দলে যায় ...'

পরিবর্তনের কথা।

'সময়ের অগ্রগতির পক্ষীরাজে চড়ে
যাব আমি নতুন দিগন্তে এই হাসি মুখে
নাই আক্ষেপ কোনো পাওয়া না পাওয়ার
সামনে রয়েছে পথ এগিয়ে যাওয়ার
সত্য কে সারথি আসে দিন আসে রাত বিরামহীন
উড়ন্ত মন মানে না বাঁধা
সূর্য্যকে ধ্যান করে নাচে মন নাচে প্রাণ
আশঙ্কাবিহীন ...'

নতুন পৃথিবীর কথা।

'নতুন পুরুষ নতুন পুরুষ
তুমি নয় ভীরু কাপুরুষ ...'

নতুন মানুষের কথা।

'এখানে বৃষ্টি মুখর লাজুক গাঁয়ে
এসে থেমে গেছে ব্যর্থ ঘড়ির কাঁটা ...'

আশাবাদের কথা।

'শীতের শিশির ভেজা রাতে ...'

প্রকৃতির অপরূপ বর্ণময়তার কথা।

'হস্তীর নাড়ান হস্তীর চাড়ান হস্তীর মাথায় বারি
ও কি ওরো সত্য কইরা কহেন মাহুত ভাই
ঘরে কয়খান নারী
তোমরা গেইলে কি আসিবে ও মাহুত বন্ধু রে ...'

গোয়ালপাড়ার ভাওয়াইয়ায় ফুটিয়ে তুলেছেন বিরহ যন্ত্রণা।

'একটি কুঁড়ি দুটি পাতা রতনপুর বাগিচা
কোমল কোমল হাত বাড়িয়ে
লছমি আজও দোলে ...'

চা-বাগিচার জীবন সঙ্গীত।

'আমায় ভুল বুঝিস না
মাইয়া ভুল বুঝিস না ...'

বিহুর পাগলা সুরে মনমাতানো সব গান।

'ইবার দিব দালান-কোঠা মা শীতলার কিড়াকাঠি
টাটালগর কারখানাতে করিবো গো চৌকিদারি
ও ও রূপসী করবো তুমার মন খুশী ...'

আদিবাসীদের প্রাণের গান।

'মোর গাঁয়ের সীমানায় পাহাড়ের ওপারে
নিশিথ রাত্রির প্রতিধ্বনি শুনি ...'

মিশমি পাহাড় ভেঙ্গে ডিহাং নদী যেখানে ব্রহ্মপুত্র রূপে আসাম উপত্যকায় প্রবেশ করেছে, সেই পাহাড়-সমতল-জঙ্গল-আদিবাসী অধ্যুষিত সদিয়ায় এক মধ্যবিত্ত শিক্ষক পরিবারে জন্ম। সুগায়িকা মায়ের লালাবাই, পাহাড়িয়া ও আদিবাসী মেয়েদের গান এবং পাখিদের সুমিষ্ট রব শুনে বড় হওয়া ভূপেন হাজারিকা অসংখ্য গান করেছেন, সুর দিয়েছেন, লিখেছেন, অসমিয়া, বাংলা, হিন্দি, ইংরাজি বহু ভাষায়। গুয়াহাটি কটন কলেজের স্নাতক, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতোকত্তর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলার। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরি। অন্যায়ের প্রতিবাদে ইস্তফা। আই. পি. টি.-এর কাজে বম্বে আগমন।

'মৌন রাতি আছে চারিদিকে
দিগন্তে সূর্য্য কোথায়?
প্রভাতী পাখীরা কেন গায় ...।'

তিনি একাধারে গায়ক, সুরকার, গীতিকার, সংস্থাপক, যন্ত্রব্যবস্থাপক, কবি, লেখক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী, অভিনেতা, চলচ্চিত্র নির্দ্দেশক, চলচ্চিত্রের সঙ্গীত নির্দ্দেশক, সমাজ কর্মী, সমাজ সংস্কারক, জন-প্রতিনিধি ...। মাত্র ১৩ বছর বয়েসে অসমিয়া চলচ্চিত্রে অভিনয়। বহু জনপ্রিয় অসমিয়া, বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রের সংগীত নির্দ্দেশক বা সঙ্গীত পরিচালক।

'রাত্রি তোমার নাম রাত্রি তোমার নাম
অঙ্গে অঙ্গে মধু জোছনা লুকোচুরি করে ...'

একবাক্যে সকলেই স্বীকার করেছেন যে তিনি শঙ্করদেব-জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়াল পুষ্ট অসমিয়া সংস্কৃতির মূল স্রোতকে অসমের বিস্তৃত বহুত্ব সহজিয়া লোক ও আদিবাসী সংস্কৃতির সাথে সুন্দরভাবে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। অসমিয়া শিল্প-সংস্কৃতির উন্নতধারাকে অবশিষ্ট ভারত ও বিশ্বের কাছে মেলে ধরেছেন।

'আকাশী গঙ্গা খুঁজিনিতো না খুঁজিনি স্বর্ণ অলঙ্কার
নিষ্ঠুর জীবনের সংগ্রামে পেয়েছি প্রেরণা ভালবাসা ...'

৫০-র দশকে অসম যখন জাতিদাঙ্গায় বিদীর্ণ তিনি তখন বিপ্লবী সংস্কৃতি সংগঠক বিষ্ণু রাভা, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, মঘাই ওঝাদের সঙ্গে সারা অসম ঘুরে গান দিয়ে দাঙ্গা থামিয়েছিলেন। ৬০-র দশকেও হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিহত করেছেন ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা।

'প্রথম না হয় দ্বিতীয় না হয় তৃতীয় শ্রেণীর আমরা সবাই
জীবন রেলের যাত্রীরে ভাই ...'

তিনি জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়াল, আব্বাসউদ্দীন, বিষ্ণু রাভাদের সাথে কাজ করেছেন। ছিলেন পল রোবসন-পিট শিগার-হ্যারি বেলাফন্টেদের বন্ধু। সলিল চৌধুরী-বলরাজ সহানীদের সহযোদ্ধা। হেমন্ত মুখার্জী, লতা মঙ্গেশকর, প্রতিমা বড়ুয়া, রুণা লায়লা-দের সহশিল্পী। এনেছেন গুলজার, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়দের মরমী কথায় প্রাণের সুর। কল্পনা লাছমি, সাই পরাঞ্জপে, মকবুল ফিদা হুসেন প্রমুখদের চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালক।

'মুই এটি যাযাবর
আমি এক যাযাবর
পৃথিবী আমাকে আপন করেছে
ছেড়েছি নিজের ঘর ...'

তিনি ছিলেন এক বিশ্ব পথিক, যিনি শান্তি, সম্প্রীতি ও প্রগতির গান গেয়ে গেছেন।

'জীবন নাটকের নাট্যকার কি বিধাতা পুরুষ
যেই হোক নাটক লেখার মত নেই তার হাত
সে নাটকে অভিনয় করতে গিয়ে দেখি দিনকে করেছে রাত ...'

ধর্মীয় ও জাতিগত ভেদাভেদ বিশেষ করে নিম্নবর্ণকে অপাংক্তেয় করে রাখার কূটকৌশল তাকে নতুন সমাজবীক্ষায় উন্নীত করেছে।

'জীবনটা যদি অভিনয় হয় অভিনয় যদি জীবন হয়
আকাশ যদি কাগজ হয় চাঁদটা যদি আসল না হয়
সেই জোছনার কি মানে ...?'

বারবার সামাজিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছেন।

'আগুন ভেবে যাকে কাছে ডাকিনি ...'
মন তবু তারে চায়

অন্য সম্প্রদায়ের হওয়ায় যৌবনের প্রেয়সীকে না পাওয়ার অব্যক্ত যন্ত্রণা ফুটিয়ে তুলেছেন গানে।

'প্রেম আমার শত শ্রাবণের বন্যা আনে ...'

গভীর বিরহে প্রবল বেদনা পেয়ে গেছেন।

'আমি ভালোবাসী মানুষকে
তুমি ভালোবাসো আমাকে
আমাদের দুজনের সব ভালোবাসা
বিলিয়ে দাও এই দেশটাকে ...'

পরে কৃতি নারী প্রিয়ংবদা প্যাটেলকে বিবাহ। অসমে গিয়ে যৌথ কাজ শুরু। পুত্র তেজের জন্ম। কিন্তু এই সম্পর্ক টেকে না।

'এক খানা মেঘ ভেসে আসে আকাশে
এক ঝাঁক বুনো হাঁস পথ হারালো
একা একা বসে আছি জানালা পাশে
সে কি আসে যাকে আমি বেসেছি ভালো ...'

নানা ভাঙ্গাগড়া। শোনা যায় প্রতিমা বড়ুয়া, মহারাণী গায়ত্রী দেবীদের সংগে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া।

'চিত্রলেখা চিত্রলেখা চিত্র তুমি আঁকো
চিত্রপটে চিন্তাশীল এক চিন্তানায়ক আঁকো না ...'

মধ্যবয়সে সপ্তদশী গুরু দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী কল্পনায় থিতু হওয়া। তারপর তাদের চল্লিশ বছরের অবিবাহিত দৃঢ় সম্পর্কের আমৃত্যু উদযাপন।

'সবুজ প্রান্তরে তোমার নিরালা ঘরে
বিদায়বেলায় ভেবেছো যে কথা বলবে হয়তো বা ভুলে গেছো...'

অসুস্থতার শেষ বছরগুলিতে কল্পনা লাছমি কর্তৃক মুম্বাইয়ে চিকিৎসা ও শুশ্রষার ব্যবস্থা।

'আর ফুল নয় আর মালা নয়
নয় ফাগুনের কোনো কাব্য
মধু রাত নয় মায়া চাঁদ নয়
মানুষের কথা ভাববো, শুধু মানুষের কথা ভাববো ...'

গণ আন্দোলনের পর '৬৭ তে নির্বাচিত হয়ে সংসদের মধ্যে মানুষের কথা বলা। পরে জাতিগত দাঙ্গার বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে, হিংসার বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতায়, জাতীয় ঐক্যের পক্ষে ভূমিকা রাখা।

'সহস্র জনে মোরে প্রশ্ন করে
বেদের মন্ত্র নয় হৃদয়ের মন্ত্র মোর মদিরা ...'

পরে জাতীয়তার পক্ষে যেতে গিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের প্রচারে সাময়িক ভেসে যাওয়া। জনতা কর্তৃক ওই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান, কিন্তু সার্বিক জনপ্রিয়তা অটুট থাকে। নিজেরও পরবর্তিতে ভুল স্বীকার। পুনরাবৃত্তি না করা।

'গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা,
দুই চোখে দুই জলের ধারা মেঘনা যমুনা ...।'

আমৃত্যু সুরেলা সঙ্গীতের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন দেশ ও জাতির অভিন্ন ঠিকানা।

'মানসী বিদায় তোমাকে বিদায়
ফুলে মালা চন্দনে সাজিয়ে দিলাম চিতায় ...'

অসমবাসী সহ সমস্ত গুণমুগ্ধ ব্যক্তি এই বর্ণময়, বিশাল মাপের, বহুপ্রতিভাধর জনপ্রিয় গায়ককে অশ্রুসজল চোখে বিদায় জানিয়েছেন। টুপি পরিহিত অনায়াস যন্ত্রসঞ্চালনে সেই আসর মাত করে দেওয়া দীর্ঘাকৃতি অবয়বকে আর কোনো দিন দেখা যাবে না। শোনা যাবে না সেই দরাজ হাসি আর ভুবনবিজয়ী চাপা সুরেলা ব্যারিটোন কণ্ঠকে।

... বিদায় ডঃ ভূপেন হাজারিকা!

নিবেদন : অরণি সেন